

শিশু শিক্ষা নিয়ে কড়াকড়ি নয়

মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা হোক, দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ারই হোক কিংবা উন্নত জাতি গঠনই হোক, শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিশ্বয়বোধ, অসীম কৌতূহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এ ছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল সম্পর্কে বলা হয়েছে, শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি প্রদর্শন থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে, যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আরও বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, শ্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আর্থিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা; তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা। কিন্তু শিক্ষার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ হওয়ার প্রত্যয়ে যারা ঘুম ঘুম চোখে নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে তাদের শক্তি কতটুকু অবশিষ্ট আছে তা আমরাই-বা কতটুকু ভেবেছি? সরকারি স্কুলের বাইরে বেসরকারি স্কুলগুলোতে বোর্ডের বই ছাড়াও সহায়ক বইয়ের নামে অসহনীয় চাপে থাকে শিশু শিক্ষার্থীরা। সহায়ক বইয়ের কারণে একদিকে শিশুদের বইয়ের বোঝা বাড়ছে, অভিভাবকদের আর্থিক বোঝাও বাড়ছে। অবশ্য অনেকের দাবি, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে থাকতে ও শিশু বয়স থেকেই সব বিষয়ে ধারণা দিতে সহায়ক বই দেওয়া হচ্ছে। যে বয়সে শিশুর বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কথা, ক্ষেত্রবিশেষে বই ছেঁড়ার কথা, সেই বয়সেই পাঁচ থেকে সাতটি বই পড়ার জন্য দিয়ে শিশুদের একেবারে নুইয়ে ফেলার আয়োজন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিশুদের ব্যাগের ওজন বাড়ছে। শরীরের ওজন কমছে।

সমাজ | মো. আসাদুল্লাহ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

জীবন থেকে শৈশব কেড়ে নিচ্ছে। সে হয়ে পড়ছে রোবট। এভাবে শিক্ষার শক্তিতে শক্তিশালী করার মহড়ায় অবতীর্ণ করার জন্য অবুঝ শিশুদের যেভাবে আমরা পরিচালিত করছি তার ফলাফল অদূর বা দূর ভবিষ্যতে কী হবে? এই যে শক্তিম্যান মানুষ বানানোর মাত্রাতিরিক্ত উদ্যোগ সেটা কতটুকু ফলপ্রসূ?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, শিশুদের মানুষ করার

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, শিশুদের মানুষ করার ব্যাপারে যতটা না আগ্রহ আমাদের, তার থেকে বেশি আগ্রহ অভিভাবক হিসেবে কতটা সফল, সেটা জাহির করার। এভাবে চলছে অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা। বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে ক্রমাগত প্রতিযোগিতার চাপ ও ভিনদেশি ভাষার ওপর নির্ভরতা আমাদের আগামী প্রজন্মকে সত্যি সত্যিই পঙ্গু করে দিচ্ছে কি-না ভাবা দরকার। কোমলমতি শিশুর মন বোঝার জন্য কোনো সময় কি আদৌ দিয়েছি, না নিজেদের স্বপ্ন অর্জন করতে না পেরে এখন সুযোগ এসেছে বলেই সেই স্বপ্ন পূরণে ওদেরকে ঠেলে দিয়েছি প্রতিযোগিতা নামক বিষবাস্পের উত্তপ্ততায়। যাতে ওরা ক্রমশ হাবুডুবু খাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে

ব্যাপারে যতটা না আগ্রহ আমাদের, তার থেকে বেশি আগ্রহ অভিভাবক হিসেবে কতটা সফল, সেটা জাহির করার। এভাবে চলছে অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা। বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে ক্রমাগত প্রতিযোগিতার চাপ ও ভিনদেশি ভাষার ওপর নির্ভরতা আমাদের আগামী প্রজন্মকে সত্যি সত্যিই পঙ্গু করে দিচ্ছে কি-না ভাবা দরকার। কোমলমতি শিশুর মন বোঝার জন্য কোনো সময় কি আদৌ দিয়েছি, না নিজেদের স্বপ্ন অর্জন করতে না পেরে এখন সুযোগ এসেছে বলেই সেই স্বপ্ন পূরণে ওদেরকে ঠেলে দিয়েছি প্রতিযোগিতা নামক বিষবাস্পের উত্তপ্ততায়। যাতে ওরা ক্রমশ হাবুডুবু খাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। সমাজ বাস্তবতায় প্রতিযোগিতার ধরন দেখে মনে

হয় এটাই যেন সাফল্য অর্জনের একমাত্র পথ। প্রতিযোগিতাহীন জীবন ব্যর্থ, নিঃস্ব, হতাশায় আচ্ছন্ন। এটা আমরা কেন ভাবি না যে, প্রকৌশলী, চিকিৎসক বা পেশাজীবী হওয়ার আগে অবশ্যই একজন ভালো মানুষ হওয়া দরকার। যখন শিক্ষাই শক্তি নামক আলোর মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল, ঠিক তখনই বাসার পাশের চায়ের দোকানে জীবনযুদ্ধে পরাজিত না হওয়ার চেষ্টারত হাসান

ক্রমাগতভাবেই হেরে যাচ্ছিল। নিজের সন্তানের মতো করে কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি যে হাসানেরও সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ আছে? শুধু পরিচর্যার অভাবে সেই সুন্দর ভবিষ্যৎ দৃশ্যমান হয়ে উঠতে পারছে না। আমরা কখনও চেষ্টা করিনি তাকে জয়ী করার। সেজন্যই হয়তো আজ এত অধিকারবঞ্চিত শিশু। কিন্তু এটাও সত্য যে, ব্যক্তিগত উন্নয়নের অগ্রযাত্রা যতই অব্যাহত থাকুক না কেন, সামগ্রিক উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেখা যাচ্ছে, লেখাপড়ার অসহনীয় চাপ শিশু শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধাকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে সৃজনশীলতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।

আমরা কি একজন সার্টিফিকেটসর্বস্ব মানুষ চাই? জীবনে সফল হওয়ার অভিপ্রায় থাকা দোষের নয়, তবে মাত্রাহীন উদ্যোগ কামা নয়। শিক্ষা বলতে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন বা সাফল্য নয়। এর বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যেমন শিশুদের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিকীকরণ ইত্যাদি। শিশুর বেড়ে ওঠা, নীতি-নৈতিকতা বা মূল্যবোধ বিকাশের প্রাথমিক স্তর হলো পরিবার। পারিবারিক পর্যায়ে মূল্যবোধ সম্পর্কে শিশুর ধারণা পরিণত বয়সে তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। ক্ষুদ্র পারিবারিক গতির বাইরে ব্যক্তির বৃহত্তর ভূমিকা, নাগরিক দায়িত্ববোধ, মতামত, ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মবিশ্বাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ব্যক্তির মানসে প্রোথিত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রেই নার্সারি, কিন্ডারগার্টেনে মানসম্পন্ন অবকাঠামো, শিক্ষার পরিবেশ নেই। নেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, গ্রন্থাগার, এমনকি পর্যাপ্ত খেলার মাঠ। এ অবস্থায় শিশুর মানসিক বিকাশ কীভাবে সম্ভব? একটা সুসজ্জিত দালানের মধ্যেই কেটে যাচ্ছে তার শিশুকাল। আধুনিকতার ছোয়া হয়তো কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু মাটির গন্ধ, দুরন্ত শৈশব থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। এভাবে শিশুরা ক্রমেই গৃহবন্দি হয়ে পড়ছে। শিশুদের খেলাধুলার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ায় টেলিভিশন, কম্পিউটার আর ভিডিও গেম তাদের বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সীমাবদ্ধ গতির মধ্যে বেড়ে ওঠায় তাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব বিষয় বিবেচনায় না নিয়েও আমরা অহর্নিশ এই প্রত্যাপাই করি যে, পরিবারকে আনন্দিত করার মানসে নির্দিষ্ট সময় শেষে আমার সন্তান যেন উত্তম ফলের একটা চার্জশিট নিয়ে হাজির হয়। বইয়ের চাপে, মানসিক চাপে সন্তানের মেরুদণ্ড একটু বেঁকে গেলেও অভিভাবকের মেরুদণ্ড শক্তিশালী করার আনন্দে ভরিয়ে দেওয়ায় চলে মিষ্টি বিতরণের উৎসব। এরপর আবারও প্রত্যাশা, আবারও ফলাফল। অবুঝ শিশুমনের ওপর অর্পিত এসব চাপ সহ্য করে শিশুটি আবার ঘুরে দাঁড়াবে এমন প্রত্যাশা, একটু অস্বাভাবিকই বটে। সন্তানের পরীক্ষার ফল নিয়ে আমরা যত মাতামাতি করি, তাদের মনোগত বিকাশ বা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে তত মাথা ঘামাই না। পরীক্ষার ফলাফলটাকেই সাফল্য মনে করি। আমরা চাই আমার সন্তান অন্য অনেকের চেয়ে সাফল্য অর্জন করুক। সেটা যেভাবেই-হোক। এটাই যেন আমাদের প্রত্যাশা। এর অবসান হলেই মঙ্গল।

ashadullah.bd@gmail.com